জয়কে নিয়ে রাজনীতি কিংবা জয়ের রাজনীতি

শওগাত আলী সাগর, *টরেন্টো থেকে*

'আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ের বাংলাদেশ সফর রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগকে কতোটা লাভবান করেছে?' বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নির্মোহভাবে এর কোনো বিশ্লেষণ করেছে কি না তা জানা নেই। তবে জয়ের ঢাকা সফর এবং তার বক্তব্য রাজনীতিতে নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে, বিতর্কও তৈরি করেছে। ঢাকার রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এ বিষয়ে তাদের প্রাজ্ঞ মতামত প্রকাশ করেছেন এবং এখনো করছেন।

'আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এগারোদলীয় জোট যখন এই সরকারের পদত্যাগের দাবিতে সুনামগঞ্জ থেকে মানববন্ধন কর্মসূচির প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমনকি যেদিন কর্মসূচিটি পালিত হচ্ছে, সে সময় জয়কে রাজনীতির আলোচনায় নামিয়ে দিয়ে সবার দৃষ্টি আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো কেন?'- এমন প্রশ্ন কোনো বিশ্লেষক তুলেছেন বলে চোখে পড়েনি। কিন্তু আমাদের বন্ধু ঋষিকেশ যখন এমন একটি মন্তব্য করে বসলেন তখন হতচকিত না হয়ে উপায় ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে সমর্থন করেন। সুদূর প্রবাসে এসেও প্রতিদিন ইন্টারনেটে ঢাকার পত্রপত্রিকা পড়ে আওয়ামী লীগের কর্মকান্ড সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখেন। জয় দেশে ফিরছেন এবং সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছেন- এই খবর অন্য অনেকের মতোই তাকেও পুলকিত করেছিলো। সেই তিনিই হঠাৎ এমন ধরনের প্রশ্ন করবেন তা ধারণায় ছিলো না।

বস্তুত, সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঢাকায় যাওয়ার পর তার কর্মতৎপরতা এবং অল্পবিস্তর মন্তব্য সুদূর কানাডায়ও বাঙালি কমিউনিটিতে ধাক্কা দিয়েছে। ডেনফোর্থের আড্ডায়, কফি টাইম বা টিম হার্টনের কফির ধোঁয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জয়ের রাজনীতি নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে, সেই আলোচনায় বরফ-ঝড় কিংবা তাপমাত্রার মাইনাস ৩৫ ডিগ্রির শৈত্যতাকেও উষ্ণ করে ফেলেছে। জয়কে নিয়ে যাদের খুবই পুলকিত দেখাচ্ছিলো, তাদের অনেকেই কেমন জানি ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ছেন। জয়ের রাজনীতিতে আসার খবরটি যতোটা না আশার সঞ্চার করেছিলো, তারচেয়েও বেশি আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এখন তার রাজনীতি এবং রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে।

সজীব ওয়াজেদ জয় সরাসরি দলীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছেন কি না - এই প্রশ্নটি এখনো অমীমাংসিত রয়ে গেছে। ঢাকায় পৌঁছার পর বিমানবন্দরে আওয়ামী লীগ জয়কে যেভাবে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা দিয়েছে তা দেখে যেকারোই মনে হতে পারে, আওয়ামী লীগ বোধকরি তার পরবর্তী নেতৃত্বকেই বরণ করে নিয়েছে। যুবলীগ, ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে দলীয় প্রধানের ছেলে এবং ছেলের বৌকে এতো বড় সংবর্ধনা দিয়েছে, তাতে শেখ হাসিনা নিজেও উপস্থিত ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও। সুধাসদনে প্যান্ডেল, মঞ্চ বানিয়ে জয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। দল সম্পর্কে, রাজনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিছু মন্তব্য করেছেন। শেখ হাসিনার অনুমোদন ছাড়া জয়কে নিয়ে এতো কিছু হয়েছে সেটা বোধকরি কোনো আহাম্মকও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, জয় তো দলীয় কেউ নন, তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দলের কোনো দায়িত্বও গ্রহণ করেননি। তাহলে কোন ক্ষমতাবলে তিনি এভাবে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন? তাকে দলের পক্ষ থেকে এতো বড় সংবর্ধনাই বা কেন? দলীয় প্রধানের ছেলে সস্ত্রীক দেশে বেড়াতে এলে দলীয়ভাবে তাকে সংবর্ধিত করতে হবে? তাও এত ঘটা করে? শেখ হাসিনা এখন ক্ষমতায় থাকলে কি জয়ের জন্য রাষ্ট্রীয় সংবর্ধনার আয়োজন করা হতো?

এসব নানা প্রশ্ন, নানা বিতর্ক যখন ডেনফোর্থের আড্ডাগুলোকে সরগরম করে তুলেছে ঠিক তখনই জয় ঘোষণা দিয়েছেন, রাজনীতিতে তিনি এখনই আসছেন না। মা নেতৃত্ব দেবেন, তিনি মাকে সহায়তা করবেন। আরো একটি কথা তিনি বলেছেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে তিনি ও তার স্ত্রী চাকরি করেন, তারা বাংলাদেশে আসা-যাওয়ার মধ্যে থাকবেন। আমরা যারা 'বিশেষ ব্যক্তিত্বদের' কথার সোজাসাপ্টা অর্থ বুঝি তাদের কাছে জয়ের এ কথার অর্থ হচ্ছে, জয়-ক্রিস্টিনা ঠিক এখনই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন না। তাহলে 'বিদেশিনী স্ত্রীকে নিজ দেশে দেখাতে' (জয়ের ভাষায়) হাসিনাপুত্রের সংক্ষিপ্ত বাংলাদেশ সফরকে খোদ আওয়ামী লীগ এতো বড় ইস্যু বানিয়ে ফেললো কেন?

'আওয়ামী লীগ হয়তো চেয়েছে জয় রাজনীতিতে আসছেন'- এই সংবাদটি রাজনীতির মাঠে কতোটা আলোড়ন তোলে তা একটু যাচাই করে দেখতে। জয়কে রাজনীতিতে সক্রিয় দেখতে অতি উৎসাহীরা জয়ের বাংলাদেশ সফর এবং তার সব কর্মকান্ডের মধ্যেই 'আওয়ামী লীগের মস্তবড় সাফল্য' খুঁজে পাচ্ছেন। সাংগঠনিক শক্তি ব্যয় করে দলীয় প্রধানের পুত্র ও পুত্রবধূকে ব্যাপক সংবর্ধনা দিয়ে তারা এই ভেবে সান্ত্বনা পেতে চাইছেন যে, জয়ের রাজনীতির আগমনী সংবাদটি সারা দেশে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছে। কিন্তু জয়ের কর্মকান্ড, বক্তব্য সম্পর্কে নির্মোহ

বিশ্লেষণ তাদের কাছে নেই। কিংবা জয়ের অল্প কয়েকদিনের তৎপরতাই তার ভবিষ্যৎকে কিভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে তা বোধকরি তিনি নিজেও ভাববার সময় এখনো পাননি।

টরন্টোতে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, ২১ আগস্টে শেখ হাসিনার জনসভায় প্রকাশ্যে গ্রেনেড হামলা ও শেখ হাসিনার প্রাণনাশের অপচেষ্টার কোনো সুরাহা হতে না হতেই জয়কে সক্রিয় দলীয় রাজনীতিতে নিয়ে আসার আলোচনাটা উঠলো কেন? জয়কে এখনই রাজনীতিতে নিয়ে আসার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কাদের আগ্রহ বেশি? এ ব্যাপারে শেখ হাসিনার মনোভাবই বা কি? এসব নানা প্রশ্ন মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারলেও তার কোনো জবাব পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। তবে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না, ২১ আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জয়কে নিয়ে বিতর্ক কিংবা রাজনৈতিক আলোচনা কারো কারো জন্য অবশ্যই স্বস্তিদায়ক। প্রয়োজনও বটে। যেমনটি হয়েছিলো ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার পরদিন থেকেই জাতীয় ঐক্যের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে ঢাকার বিশেষ একটি মহলের অতি উৎসাহী তৎপরতা। কারা শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টা চালিয়েছিলো তা উদ্‌ঘাটনের চেয়েও জাতীয় ঐক্য জরুরি হয়ে পড়ায় অন্তত সে সময় সরকার খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে। হামলাকারীরাও কিছুটা আড়াল পাওয়ার সুযোগ পেয়েছে। হঠাৎ করে জয়কে রাজনীতিতে টেনে আনার আলোচনার মধ্যেও ওই 'জাতীয় ঐক্য জরুরি হয়ে পড়ার মতো' উদ্দেশ্য আছে বলে টরন্টোর অনেক আড্ডায় লোকজনকে মন্তব্য করতে শুনেছি।

তবে জয়ের রাজনীতিতে আসা না আসা নিয়ে শেখ হাসিনার প্রাথমিক মন্তব্যটি অনেককেই কিছুটা স্বস্তি দিলেও পরবর্তীতে আরো দ্বিধা তৈরি করেছে। জয় বাংলাদেশে আসার আগে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'জনগণ চাইলে এবং তার ভালো লাগলে সে রাজনীতিতে আসবে। জয় রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে। সে যদি রাজনীতিতে আসতে চায়, তা তার নিজের যোগ্যতা বলেই আসবে। মা হিসেবে আমি তাকে প্রতিষ্ঠিত করবো না।' (প্রথম আলো, ২০ ডিসেম্বর, ২০০৪)

ছেলের রাজনীতিতে আসা না আসা সম্পর্কে শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে যে মন্তব্য করেছেন তা একজন সাধারণ শিক্ষিত মায়ের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু শেখ হাসিনা অবশ্যই জানেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যেমন অতোটা সাদামাটা নয়, আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতিও একেবারে সরলরেখায় পরিচালিত হচ্ছে না। জয় রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে- এটা যেমন সত্য, জয়ের বেড়ে ওঠা, শিক্ষা-দীক্ষা ও রুচিবোধ গড়ে উঠেছে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে। তিনি এখনই বাংলাদেশের রাজনীতির কুটিলতা এবং জটিল অলিগলি সম্পর্কে কতোটা ধারণা রাখেন সেটি প্রশ্ন সাপেক্ষ। সেখানেই সচেতন মা হিসেবে শেখ হাসিনার দায়িত্ব পড়ে যায়, দেশের রাজনীতি এবং নিজ দলের রাজনীতির কুটিলতা ও বক্রতাগুলো জয়ের সামনে তুলা ধরা। এসব বিষয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে যদি জয় মনে করেন, তিনি রাজনীতিতে আসবেন তাহলেই তিনি রাজনৈতিক ফায়দা লুণ্ঠনকারীদের এড়িয়ে সত্যিকার অর্থে রাজনীতিতে ভালো কিছু উপহার দিতে পারবেন। আর তা না হলে দলীয় রাজনৈতিক বলয়ে চাটুকার বা তোষামোদকারীদের খপ্পরে পড়ে গতানুগতিক ধারায় গা এলিয়ে দিয়ে ইতিহাস থেকে মুজিব পরিবারের বিদায়ের পথটাকে সুগম করতে সহায়তা করবেন মাত্র।

আমরা পত্রপত্রিকায় তেমন কিছু পড়ার সুযোগ পাইনি। তবে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিস্টদের আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক থেকে এটুকু অন্তত বোঝা গেছে, বেগম খালেদা জিয়ার পুত্র তারেক রহমানের কর্মতৎপরতা পাল্টাপাল্টি জবাব হিসেবেই নাকি জয়কে রাজনীতিতে আনার এই প্রচেষ্টা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে এর মূল্য দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। শেখ হাসিনার জন্যও তেমন করুণ পরিণতিই হয়তো অপেক্ষা করছে বলে অনেকেই আক্ষেপ করছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতির নির্মমতা হচ্ছে, বাংলাদেশে এখন

এখন নিরপেক্ষতা মানেই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করা, মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারকে সমান বাটখারায় মাপ দেয়া, পারলে মুক্তিযুদ্ধকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া। নিরপেক্ষতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেনারেল জিয়াকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া, নিরপেক্ষতা হচ্ছে যতোটা সম্ভব বেশি করে আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করা এবং মৌলবাদ তথা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করে নেয়ার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা

কিন্তু শেখ হাসিনা তার নিজের কথা রেখেছেন কতোটা তা নিয়েও বোধকরি প্রশ্ন তোলা যায়। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে ছেলেকে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেননি সত্য কিন্তু দলকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন ছেলের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার কাজে। কিন্তু ছেলে সেই দলটিকে ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েও তাকে কাজে লাগাতে পারেননি বরং দল এবং নিজেকে বিতর্কিত করেছেন।

জয়কে রাজনীতিতে নিয়ে আসার তোড়জোড় এবং ২১ আগস্টের শেখ হাসিনার প্রাণনাশের চেষ্টার কোনো সুরাহা হওয়ার আগেই তার সন্তানকে নিয়ে এতো আলোচনার সূত্রপাত দেখে এখানকার অনেকেই প্রশ্ন করেছেন, তাহলে কি বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে শেখ হাসিনার বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে? সেটি কি শেখ হাসিনার সিদ্ধান্ত? নাকি দলের ভেতরে-বাইরে তথাকথিত শুভাকাঙ্ক্ষীদের মুখোশের আড়ালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনাবিরোধী শক্তির উদ্যোগ এটি? প্রবীণ সাংবাদিক কে জি মোস্তফা তাঁর এক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন, 'সময়টা এখনো হাসিনার, জয়ের নয়।' কিন্তু কারা হাসিনার রাজনীতির এ সময়টাকে জয়ের হাতে তুলে দিতে বেশি আগ্রহী, সে সম্পর্কে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি দোদুল্যমান এবং দ্বিধাবিভক্ত, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি প্রবলভাবে ঐক্যবদ্ধ। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে কালোবাজারি-ব্যবসায়ীদের কিছু গ্রুপ। ক্ষমতার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় এই গ্রুপগুলো এখন অর্থে-বিত্তে-সম্পদে এতোটাই শক্তিশালী যে জনমতকে নানাভাবে প্রভাবিত করার সামর্থ্য এদের আছে। এদের ক্ষমতার দৌড় এতোটাই যে, এরা আজীবন ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি করা ব্যক্তিদের দিয়েও 'বাংলাদেশ এখন মডারেট মুসলিম দেশ' বলে সহজেই প্রচারণা চালাতে পারে। বাংলাদেশে এখন নিরপেক্ষতার নতুন নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে। এখন নিরপেক্ষতা মানেই হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে খাটো করা, মুক্তিযোদ্ধা আর রাজাকারকে সমান বাটখারায় মাপ দেয়া, পারলে মুক্তিযুদ্ধকে একেবারে বাদ দিয়ে দেয়া। নিরপেক্ষতা হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে জেনারেল জিয়াকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া, নিরপেক্ষতা হচ্ছে যতোটা সম্ভব বেশি করে আওয়ামী লীগকে সমালোচনা করা এবং মৌলবাদ তথা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করে নেয়ার পক্ষে জনমত গড়ে তোলা।

বাংলাদেশ এখন স্বাধীনতার মূল্যবোধের বিরোধী শক্তির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রাষ্ট্রীয়

প্রচারযন্ত্রের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এদের হাতে। এর বাইরেও কিছু পত্রপত্রিকা এদের হয়ে কাজ করছে। সামরিক-বেসামরিক অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের কেউ কেউ লেখক, কলাম লেখক হয়েছেন নতুন এই নিরপেক্ষতার তত্ত্ব বাস্তবায়নে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে। আর এই নিরপেক্ষদের প্রধান টার্গেট বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শেখ হাসিনা। বলাই বাহুল্য, বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব নিয়ে যতোটা সমালোচনা হয়, আর কাউকে নিয়ে তা হয় না। শেখ হাসিনার দলের লোকেরা যেমন তার সমালোচনা করেন, বিরোধীরাও তা করেন। রাজনীতি থেকে শেখ হাসিনাকে সরিয়ে দিতে একটি মহল যেমন তৎপর, শেখ হাসিনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতেও তাদের তৎপরতা থেমে নেই। তার প্রমাণ তো জাতি পেয়েছে হাতে নাতে। মৌলবাদী পত্রিকায় যেমন লেখা হয়, শেখ হাসিনা নেতৃত্ব থেকে সরে না গেলে আওয়ামী লীগ আর কোনো দিনই ক্ষমতায় যেতে পারবে না, বাম তাত্ত্বিকরাও তেমন সমালোচনা করেন- শেখ হাসিনাই দলটাকে ডুবালো। দুর্ভাগ্য হচ্ছে, তারা নিজেরাও এই সমালোচনার ক্ষেত্র তৈরি করেন। প্রশ্ন হচ্ছে, খোদ শেখ হাসিনাই যেখানে এমন পরিস্থিতিতে রাজনীতি করছেন, সেখানে বাংলাদেশের রাজনীতির কুটিলতা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতাহীন জয় এখনই এলে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে কতোটা টিকতে পারবেন?

বস্তুত জয় তার সংক্ষিপ্ত ঢাকা সফরকালে রাজনীতিতে উজ্জীবিত হওয়ার মতো বা তাকে নিয়ে নতুন আশা বাঁধার মতো কোনো কথাবার্তা বলেননি। তাঁর চিন্তা-চেতনায় কোনো গ্ল্যামার বা চৌকসভাব আছে তারও কোনো প্রমাণ তিনি রাখতে পারেননি। তবে বাংলাদেশে সুস্থ রাজনীতির স্বপ্ন দেখেন এমন জনগোষ্ঠী জয়কে ঘিরে আওয়ামী সমর্থক তরুণ গোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ উচ্ছ্বাসের বাড়াবাড়ি দেখে খানিকটা হলেও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। যদিও প্রবীণ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক এ বি এম মূসা লিখেছেন, 'আওয়ামী লীগেরই একটি মহল প্রথমেই জয় সম্পর্কে একটি বিকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। তিনি তার মাতাম হের ঔদার্য্য ও হৃদয়ের বিশালতার উত্তরাধিকার হতে পারবেন কি না, সে সম্পর্কে একটি সন্দেহ সৃষ্টি করা হল। ... জয়ের অবস্থানকালে যেভাবে তারা তাকে ঘিরে রেখেছে তা তার ভবিষ্যৎ রাজনীতির প্রতি শুভ ইঙ্গিত নয়।... যে অশুভ চক্রটি তার মাকে ঘিরে রেখে ক্ষমতায় থাকাকালে বাস্তব অবস্থান অনুধাবন করতে দেয়নি, পাঁচ বছর তাকে অন্ধকারে রেখে জনবিচ্ছিন্ন করে ত্যাগী কর্মীদের দূরে সরিয়ে রেখে আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতি নিশ্চিত করেছিল, তারাই কি তাকে ঘিরে রাখার চেষ্টা করেছে?'

জয়কে যারা এখনি রাজনীতিতে দেখতে

যুবলীগে যুবকদের চেয়েও বৃদ্ধদের পদভার বেশি। ছাত্রলীগের অবস্থাও তথৈবচ। ছাত্রলীগ বা যুবলীগে স্বাধীন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা চর্চার সুযোগ আছে কি? তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি যুবলীগ বা ছাত্রলীগকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে তোষামোদকারী হিসেবে গড়ে তোলা হলে কি সেখানে তারুণ্যের সমাবেশ ঘটবে? অবশ্যই ঘটবে না

আগ্রহী এ বি এম মূসা তাদের মধ্যে অন্যতম। ফলে ঢাকায় জয়ের পারফর্মেন্স তাকেও পীড়িত করে থাকতে পারে। কিন্তু তার এই বিশ্লেষণকে একবাক্যে মেনে নিয়েছেন এমন ভক্তসংখ্যাও তেমন একটা চোখে পড়েনি। জয়কে নিয়ে অতি উৎসাহ যারা দেখিয়েছেন তারা এখনো শেখ হাসিনার বিশেষ আশীর্বাদপুষ্ট। ঢাকায় জয়ের কর্মকান্ড পরিচালিত হয়েছে যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ এবং ছাত্রলীগের মধ্যে। বলতে গেলে এরাই জয়কে ঘিরে রেখেছিলো। তারেক রহমানের শুভেচ্ছা-বার্তাও ফিরিয়ে দিয়েছে এরাই। 'আওয়ামী লীগের একটি মহলই যে জয়ের বিকৃত চিত্র উপস্থাপন করতে তারেকের শুভেচ্ছা বাহকদের নাজেহাল করে ফিরিয়ে দিয়েছে'- জয়ের কথাবার্তায় কিন্তু তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং কথাবার্তায় তিনি প্রমাণ দিয়েছেন, তারেকের শুভেচ্ছা-বার্তা গ্রহণ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি তার ছিলো না। জয় তো স্পষ্টই বলেছেন, 'আমার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ওরা আসেনি!'

বাংলাদেশের মানুষ সহনশীলতা পছন্দ করে। তারা সৌজন্যবোধ, ভদ্রতা পেতে যেমন আগ্রহী, অন্যের মাঝে তা দেখতেও সমান আগ্রহী। তারেক রহমান জয়-ক্রিস্টিনাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়ে সৌজন্যবোধের যে পরিচয় দিয়েছেন, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বড় হয়ে ওঠা জয় কিন্তু সেই সৌজন্যবোধটুকু দেখাতে পারেননি। এ নিয়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে ঢাকার কাগজে।

টরেন্টোর আড্ডাগুলোতেও একই আলোচনা, 'কানাডায় তথা উত্তর আমেরিকায় আমরা দেখি, বাসে, সাবওয়েতে, রাস্তায় পরিচিত বা অপরিচিত কেউ একজন তাকালে অন্যজান হাসে, একজন 'হাই' বললে অন্যজন আরো অধিক আন্তরিকতা নিয়ে 'হ্যালো' বলে। জয় এতো বছর আমেরিকায় পড়াশুনা করে কি উত্তর আমেরিকার অতি স্বাভাবিক ও বহুল প্রচলিত এই সভ্যতাটুকু শেখেনি? তাহলে সে রাজনীতিরই বা কি শিখেছে?' এ রকম বক্তব্য সংবলিত একটি চিঠিও ছাপা হয়েছে স্থানীয় একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায়। পত্রলেখিকা আরো এক ধাপ এগিয়ে জয়কে আক্রমণ করেই লিখেছেন, 'উত্তর আমেরিকায় বেশ ক'বছর কাটিয়ে চুটিয়ে প্রেম করা ছাড়া রাজনীতির কালচার এবং কথা বলার ধরন রপ্ত করতে পারলেন না?' আওয়ামী বন্ধুরা হয়তো বলবেন, 'এ সবই বিরোধীদের প্রচারণা। জয়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের খবরে ভীত হয়ে সরকার তার এজেন্টদের দিয়ে জয়ের চরিত্র হননের চেষ্টা করছে...।' কি জানি? তাও হয়তো হতে পারে! কিন্তু বাংলাদেশে যারা সুস্থ রাজনীতির স্বপ্ন দেখেন, তারা অন্তত জয়ের মুখে 'আমাকে তারেকের সঙ্গে তুলনা করবেন না, আমি মাস্তান নিয়ে চলি না'- এ ধরনের মন্তব্য কিংবা অন্যের শুভেচ্ছা গ্রহণ না করার মতো অনুদার আচরণ দেখে মোটেই আশাবাদী হতে পারেননি। দেশবাসীর কাছে জয়ের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করেনি।

বিমানবন্দরের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনার পর জয়ের টুঙ্গিপাড়া সফরকে জমকালো করার সব উদ্যোগই নেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু নিরাপত্তাজনিত কারণে তার সেই সফর বাতিল হয়ে যায়। সেটি নিয়ে নানা স্থানে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করতে হবে কেন? আওয়ামী লীগই বা তা অনুমোদন করলো কিভাবে? জয়ই বা তা হতে দিলেন কিভাবে? ঢাকার পত্রিকায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি পড়ে তো ভিরমি খাওয়ার মতো অবস্থা। স্বেচ্ছাসেবক লীগ বিবৃতি দিয়েছে, 'জয়কে সরকার টুঙ্গিপাড়া যাওয়ার অনুমতি দেয়নি। আমরা তার নিন্দা জানাই।' এই বিবৃতি পড়ে হাসবো, না কাঁদবো? আওয়ামী লীগও তো বলছে না, সরকার জয়কে টুঙ্গিপাড়া যেতে দেয়নি। তাহলে স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিবৃতি দিলো কি করে? এরা কি রাজনীতি করেন ন্যূনতম খোঁজখবর না রেখেই? এ বি এম মূসাও বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন ভিন্নভাবে। তার ব্যাখ্যা, '...জুজুর ভয় দেখিয়েছেন, তার চলাচল ও জনগণের সঙ্গে

মেলামেশা সীমিত করার জন্য নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়েছেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না তারা একটুখানি ঘাবড়ে গেছেন এবং কারণটি পরিষ্কার। শেখ মুজিবের নাতির ক্যারিশমা বিদ্যমান রাজনীতিতে ম্যাজিকের মতো কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে তা না বোঝার মতো মূর্খ তারা নন।' কিন্তু বাস্তবতা হলো, 'শেখ মুজিবের নাতির ক্যারিশমা' কিন্তু জয় দেখাতে পারেননি। সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সুধা সদন থেকে টুঙ্গিপাড়ার সব কর্মসূচি স্থগিত করে দিয়ে 'বালখিল্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 'শেখ মুজিবের নাতির ক্যারিশমা'র কি আছে তা বোঝার মতো জ্ঞানও অবশ্য আমাদের এখনো হয়নি। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, শেখ মুজিবের নাতি সামান্য গোয়েন্দাদের চিঠিতে দমে গিয়ে ঘরে বসে পড়লেন, সরকারকে গালিগালাজ করলেন- এর মধ্যে ক্যারিশমার কি আছে?

স্বেচ্ছাসেবক লীগ সুধা সদনে প্যান্ডেল করে মঞ্চ বানিয়ে জয়ের জন্য রাজনৈতিক মহড়ার আয়োজন করেছিলো। সেই মহড়ায় যুবলীগ, ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতারা দল বেঁধে গিয়ে জয়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন, জয় নেতার মহড়া দিয়ে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। সেই 'মহরত অনুষ্ঠানে' অবশ্য আওয়ামী লীগকে নামানো হয়নি। ওই অনুষ্ঠানেই জয় মন্তব্য করেছেন, 'বিএনপি নয়, জামাত নয়, আওয়ামী লীগের শত্রু আওয়ামী লীগই।' আওয়ামী রাজনীতির অতি প্রকাশ্য একমাত্র এই ব্যাধিটি জয়ের মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে মিডিয়ায় ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করে দিয়ে দলের কোন অংশের প্রতি কি ম্যাসেজ পাঠানো হলো তা অবশ্য এখনো পরিষ্কার নয়। 'দলের প্রবীণ নেতৃত্ব তথা চাচাগোষ্ঠীর জন্য এটি কোনো ধরনের হুঁশিয়ারি বার্তা কী না এমন প্রশ্নও আড্ডায় শোনা যাচ্ছে। কিংবা ঢাকা ত্যাগের আগ মুহূর্তে বিমানবন্দরে মা শেখ হাসিনার উপস্থিতিতেই জয় যখন মন্তব্য দেন, 'বাংলাদেশ একটি অমিত সম্ভাবনাময় দেশ, যোগ্য নেতৃত্ব পেলে এই দেশটির উন্নয়ন সম্ভব।' তখন সেই 'যোগ্য নেতৃত্ব' দিতে না পারার ব্যর্থতার দায়ভাগটা মা শেখ হাসিনার কাঁধেও বর্তায় কী না? কেননা, শেখ হাসিনা পাঁচ বছর এই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, এখনো তিনি জাতীয় সংসদে প্রধান বিরোধীদলীয় নেত্রী।

জয়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতারা আশা করছেন, 'সে রাজনীতিতে এলে নতুন মাত্রা যুক্ত হবে।' কিন্তু সেই নতুন মাত্রাটা কি কিংবা কোন লাভটা হবে তা কেউই স্পষ্ট করে বলছেন না। শুনেছি, আওয়ামী লীগের অনেকেই মনে করেন, জয়ের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের মধ্যে নাকি তারুণ্যের জোয়ার দেখা দেবে।

আওয়ামী লীগের মতো একটি সংগঠনে তারুণ্যের জোয়ার তৈরির জন্য জয়কে রাজনীতিতে আনতে হবে, নইলে হবে না, এটা কেমন ধারণা? দেশের ভদ্র, শিক্ষিত, সচেতন তরুণ গোষ্ঠীকে দলীয় রাজনীতিতে টেনে আনার কি কোনো উদ্যোগ আছে আওয়ামী লীগের? যুবলীগে যুবকদের চেয়েও বৃদ্ধদের পদভার বেশি। ছাত্রলীগের অবস্থাও তথৈবচ। ছাত্রলীগ বা যুবলীগে স্বাধীন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা বা চর্চার সুযোগ আছে কি? তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি যুবলীগ বা ছাত্রলীগকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে গড়ে ওঠার সুযোগ না দিয়ে তোষামোদকারী হিসেবে গড়ে তোলা হলে কি সেখানে তারুণ্যের সমাবেশ ঘটবে? অবশ্যই ঘটবে না। বাস্তবতা হচ্ছে, তরুণ প্রজন্মের এই সংগঠনগুলো গতিশীল করার কোনো উদ্যোগ বা ইচ্ছা আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে নেই।

সবাই জানে, ছাত্রলীগ স্বতন্ত্র সংগঠন হলেও তারা নিজেরা কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তাদের দেখভাল করার জন্য ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটি কমিশন বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটি আবার কেন? ছাত্র সংগঠনটি যদি স্বাধীনভাবে সংগঠন পরিচালনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেতৃত্বের চর্চা করে বেড়ে উঠতে না পারে, তাহলে ভালো গতিশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠবে কি করে? পত্রিকার খবরে জানা গেছে, ছাত্রলীগের সম্মেলন হয় না বছরের পর বছর ধরে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেছেন, সম্মেলন কবে হবে সেটি নির্ধারণ করবেন সভানেত্রী। কেন? ছাত্রলীগের সম্মেলন কবে হবে সেই মামুলি বিষয়টিও শেখ হাসিনাকেই ঠিক করে দিতে হবে কেন? ছাত্রলীগের নেতৃত্বের কাজ কি তাহলে? কিংবা ওবায়দুল কাদের কমিশনই বা কি করে? কয়েক বছর আগে শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরীকে ছাত্রলীগের সভাপতি বানিয়েছিলেন। তার সেই সিদ্ধান্ত সারা দেশে প্রশংসিত হয়েছিল। দেশের মেধাবী ছাত্ররা রাজনীতির প্রতি কিছুটা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলো। কিন্তু আওয়ামী নেতৃত্ব তাকে তেমন একটা ভালোভাবে বরণ করে নিতে পারেনি। স্বল্পতম সময়েই সম্মেলন করে সেই সময়কার নেতৃত্বের পরিবর্তন করা হয়েছে। অথচ এর পরে কয়েকটি কমিটি নেতৃত্ব দিয়েছে গড়ে সাড়ে ৩ থেকে ৪ বছর পর্যন্ত। আওয়ামী নেতৃত্ব যদি মেধাবী ছাত্রদের দলীয় নেতৃত্বে রাখতে অনীহা দেখিয়ে তোষামোদকারীদের বছরের পর বছর নেতা বানিয়ে রাখে, তাহলে জয় এসে সেই রাজনীতিতে নতুন করে আর কি মাত্রা যোগ করবেন? জয়কে এখনই রাজনীতিতে এনে নয়, আগে দলের নেতাদের মনমানসিকতা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সংস্কার করে গতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই ভবিষ্যতে জয়দের পক্ষে নেতৃত্ব দেয়া কিংবা নতুন মাত্রা যোগ করা সহজ হবে। নইলে গতানুগতিক রাজনীতির ধারায় জয়ও বিতর্কিত হয়েছেন, অতি সহজে রাজনীতিতে ফুরিয়েও যাবেন।

কিন্তু আমার কাছে সব সময়ই মনে হতো, জয়ের রাজনীতিতে আসা-না আসার বিষয়টি একেবারে ঠুনকো বা মামুলি কোনো ব্যাপার নয়। আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মী যদিও মনে করছেন, 'আগামী নির্বাচনে জয় আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে মায়ের পাশে দাঁড়ালে ভোটের লড়াইয়ে তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারবেন।' অনেকে মনে করেন, ভোটের লড়াইয়ে তুরুপের তাস হয়ে ওঠার চেয়েও এখানে বড় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতির আদর্শের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। জাতির কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রান্তিকালে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারার গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রস্তুতির প্রশ্ন। যেমনটি করেছেন ভারতের সোনিয়া গান্ধী তার কন্যা প্রিয়াংকা গান্ধীর ক্ষেত্রে। সোনিয়ার বিদেশিনী অপবাদের মুখে রাজীব-সন্তানরা ভোটের প্রচারণায় নামলেও প্রিয়াংকা নিজে নির্বাচন, ক্ষমতা ইত্যাদি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। অথচ ভারতের জনগণের কাছে প্রিয়াংকা হয়ে উঠেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর প্রতিকৃতি হিসেবে। আর এই বিষয়টিই কাজে লাগাতে তুরুপের তাসের মতো প্রিয়াংকা ভাইকে সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজে থেকে গেলেন মূল রাজনীতির মাঠের বাইরে? সোনিয়া বোধকরি চাচ্ছেন না একবারেই সবকিছু ফুরিয়ে ফেলতে। কিন্তু আওয়ামী লীগের নেতারা কেন চাচ্ছেন মুজিব পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে 'ফুরিয়ে' দিতে?

আগে বলেছিলাম, ভোটের লড়াইয়ে জয়ের তুরুপের তাস হয়ে ওঠার চেয়েও এখানে বড় বিষয় হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতির আদর্শের উত্তরাধিকারের প্রশ্ন। জাতির কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ক্রান্তিকালে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারার গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রস্তুতির প্রশ্ন। কিন্তু মুজিব দৌহিত্র জয়ের স্বল্প সময়ের পারফর্মেন্সে আমরা যা দেখলাম, সেটি কিন্তু এই ধারণার অনেক অনেক দূরে। এখন পর্যন্ত সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশে বিদ্যমান বহু বছরের পরনো ক্লেদময় বিভেদ, প্রতিহিংসা, অন্যকে সম্মান করতে না পারার রুচিহীন রাজনীতির আবর্তেই ঘুরপাক খাচ্ছেন। আওয়ামী রাজনীতির তোষামোদকারীরা এভাবেই হয়তো মুজিব পরিবারের শেষ উত্তরাধিকারীকে রাজনীতির নষ্ট বলয়ের দিকে ঠেলে দিয়ে তাকে সস্তা করে তুলে, ফুরিয়ে অট্টহাসি হাসার অপেক্ষায় আছেন। দুর্ভাগ্য, সজীবের মতো সম্ভাবনাময় তরুণরা অবিবেচকের মতো নতুন পথ তৈরির চেষ্টা না করেই পুরনো পথের যাত্রী হতে চলেছেন।

ছবি : **ইনামুল কবীর**